স্পর্শ : এক 'সুদূরের মিতা'র আখ্যান

অনিকেত মহাপাত্র

ইলিয়ানা রোজেনবার্গকে চেনেন নাকি? এই বার্গ-টার্গ শুনলে আইসবার্গের কথা মনে পড়তে পারে। অবশ্য কথাসাহিত্যিক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'স্পর্শ' উপন্যাসের ক্ষেত্রে আইসবার্গের প্রসঙ্গটি বড়ই উপযুক্ত। যে রহস্যের জাল বুনেছেন কথাকার তা পাঠককে টানটান উত্তেজনায় স্নায়ুগুলিকে সাজাগ করে রাখবে। অথচ 'স্পর্শ' পড়তে গিয়ে এই অর্বাচীনের কখনওই একে নিছক রহস্য উপন্যাস মনে হয় নি। আর উপন্যাসের নামটিও কোনো মোটা দাগের রহস্য উপন্যাসের কথা বলে না। এতে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্পর্শ। নিতান্তই পেশাগত কারণে কয়েকটি তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে একটি ল-ফার্মের অনুসন্ধানকারীরা জড়িয়ে পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করা এক চরিত্রের সঙ্গে; তেমনই সুদূর ইউরোপে সদ্য প্রয়াত নারীর অন্তিম ইচ্ছার সঙ্গে। শুধু তাই নয় এরই সূত্র ধরে জার্মানি কর্তৃক ইহুদি নিধনের বীভৎসতার বিষয়টিও আখ্যান মার্গে উঠে আসে।

গালিবের সাহচর্যে উপন্যাস এগোতে থাকে। বিভিন্ন মুহূর্তে গালিবের শেরগুলি বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতকেও বেঁধে দেন ঔপন্যাসিক। অতীত স্পষ্ট - বারে বারে; ধ্রুবপদের মতো কাজ করে যায়। একজন জার্মান সৈনিক হাত বাড়িয়ে দেন নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে পালানো ইহুদি মেয়েটির দিকে। আশ্বস্থ করেন 'নো ফিয়ার' এবং পরিচয় দেন 'ইন্ডিয়ান' বলে। পটভূমি ইউরোপ। সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন। ওই সৈনিক মেয়েটির রোজরিটাও (জপমালা) খুঁজে এনে দেন।

ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের পাইলট হিরন্ময় হালদার। বাড়ির অমতের কারণে পালিয়ে গিয়ে একজন যুবক অদম্য জেদকে সম্বল করে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ভলেন্টিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়ে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের এয়ারবেস থেকে আক্রমন শানান জার্মানির ভূখণ্ডে। আর বীরত্বের জন্য ডেকরেটেড অফিসার হিসেবে সম্মানিত হন; পান বিশেষ সম্মান ফ্লাইং ক্রস। এই হিরন্ময় হালদারের নামে জুলিয়ানা রোজেনবার্গ নাম্নী এক জার্মান ভদ্রমহিলা মৃত্যুপূর্ব উইলে প্রভূত অর্থ রেখে যান। মৃত্যুর পর জার্মান এমব্যাসি হিরন্ময় হালদারের কোলকাতার ঠিকানায় যোগাযোগ করে কোলকাতাস্থিত একটি ল-ফার্মের মাধ্যমে। জানা যায় হিরন্ময় হালদার মারা গেছেন। ফলে রোজেনবার্গের অর্থ হিরণ্ময় হালদারের রক্ত সম্পর্কিতদের মধ্যে বন্টন করা হবে - জার্মান আইন অনুযায়ী এটাই বিধেয়। ৩৭/২ প্রিয়নাথ বোস লেন, শ্যামবাজারের এই ঠিকানায় তখন হুলস্থুল পড়ে গেছে। ভাইপো, ভাগনে সবাই টাকাকড়ি পাবার জন্য ব্যাগ্র। মায় বাড়ির চৌকিদার অব্দি। প্রত্যেকেই এটি স্পষ্ট করার জন্য ব্যস্ত কার কত বেশি ঘনিষ্ট ছিলেন তিনি। সঙ্গে মুচকি হাসিও চোখে পড়ে হিরণ্ময়বাবুর ইউরোপ গিয়ে! এরকম নারী সংসর্গের বিষয়ে। খুব গভীর কোন 'ইয়ে' ছিল নয়তো এমন করে টাকাকড়ি দিয়ে যাবেই বা কেন। আর হিরণ্ময় হালদার বিয়েই বা করেন নি কেন!

ম্যাকলিন অ্যান্ড স্টুয়ার্ড ল-ফার্ম থেকে অনুসন্ধানের দায়িত্বে থাকা জরিনা ইসমাইল তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গভীর প্যাশন থেকে বিষয়টিকে দেখতে শুরু করে।

> "...ইলিয়ানা রোজেনবার্গ আমাদের ক্লায়েন্ট। ক্লায়েন্ট কেন তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাবে? কেসটা ইনিশিয়েট করছে ইলিনিয়া রোজেনবার্গের সলিসিটর ফার্ম। ইলিয়ানা রোজেনবার্গ হিরণ্ময় হালদার সম্পর্কে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বোঝাতে একটি মাত্র তথ্য দিয়েছে, হিরণ্ময় হালদারের ফ্লাইং ক্রসটা উনি নিলাম থেকে কিনে মৃত্যুর পরও ওঁর কবরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। ওঁর নাম, জার্মানির ঠিকানা, মৃত্যুদিন আর শেষ ইচ্ছাপত্র ছাড়া কোনও তথ্য নেই।"

ইলিয়ানা রোজেনবার্গ -এর জন্ম সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায়। সেই দেশের একটি শহর নেদেলজার থেকে কিছু দূরবর্তী এক গ্রামে। যে গ্রামটি প্রায় ছবির মতো সুন্দর। এই প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া বর্ণনার সাহায্য নেব। তাঁর সলিসিটার ফার্ম তো তাঁর ব্যাপারে বিশেষ তথ্য দেয়নি তাহলে বর্ণনা পাওয়া যাবে কী করে! সেক্ষেত্রে আখ্যান

ভাগে এইসব সংযোজিত তথ্য পাওয়ার মাধ্যম ইন্টারনেট; কখনও উইকি কখনওবা ইউটিউব।

> ''আমাদের গ্রামটা ছিল ছবির মতো সুন্দর। এখনও চোখ বুজলে সেই গ্রামের ছবি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনও ক্যালেন্ডার বা পিকচর পোস্টকার্ডে অত সুন্দর ছবি ছাপানো হয়নি। আমার বাবা-মা আমাদের তিন ভাইবোনকে নিয়ে খুব সুখের একটা সংসার করতেন। আমার উপরে ছিল দুই দাদা। আমি ছিলাম সবার ছোট। তাই আমাকে নিয়ে সবার আহ্লাদটাও ছিল বেশি। ফুলের কুঁড়ি আগলে রাখার মতো ওরা আমাকে আগলে রাখত। আমরা ছিলাম একটা খুব হাসিখুশি ইহুদি পরিবার। বাবা বলতেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী পরিবার আমরা। প্রায়ই আমরা ছুটি কাটাতে আড্রিয়াটিকের সোনার বেলাভূমিতে যেতাম। সেখানে খুব হুটোপুটি করতাম দাদাদের সঙ্গে।''

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই চেনা ছবিটি বদলাতে শুরু করল। যখন তাঁর বয়স প্রায় আটবছর তখন থেকেই দেখলেন তাঁদের হাসিখুশি পরিবারটি কোনও কিছু বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড চিন্তিত। শুনতে পেলেন জার্মানি একটিও গুলি না খরচ করে যুগোস্লাভিয়ার প্রতিবেশী দেশ অস্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছে। পরে পরে বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আর জার্মানি পোল্যান্ড দখল করে রাশিয়ার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছে।

> ''তখন আমাকে শেখানো হল, আমরা ইহুদি আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।... তখনও পর্যন্ত অবশ্য আমার জীবন বদলায়নি। রোজ হুইসেল দিতে দিতে ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া কয়লা পোড়ার সুবাস নিতে নিতে ট্রেনে করে স্কুলে যাওয়াটা খুব উপভোগ করতাম। তবে কয়েকটা জিনিস আস্তে আস্তে বুঝতে আরম্ভ করলাম। আমরা যারা ইহুদি তারা যেন একটু একটু করে প্রান্তিক হয়ে যাচ্ছি। স্কুলে যুদ্ধের খবরও শুনতাম। বুঝতে শিখলাম আমরা যারা ইহুদি তাদের জন্য গেস্টাপো এক ভয়ঙ্কর জিনিস।...''

এবার যুদ্ধ এল যুগোশ্লাভিয়ায়ও। নাৎসি আক্রমণ এল বেলগ্রেডের দিক থেকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া আত্মসমর্পণ করল নাৎসিদের কাছে। তার দুই দাদা যদিও পূর্বেই জোসেফ টিটোর কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য হয়ে চলেগেছিল। তাদের পাঠিয়ে ছিল তার বাবা, নাৎসিদের প্রতিরোধ করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। যদিও ছোট ইলিয়ানাকে তা জানানো হয়নি। বলা হয়েছিল যে তার দাদারা বেলগ্রেড পড়তে গিয়েছে এবং সেখানে হস্টেলে থাকবে। আর কোনো দিন তাঁর সঙ্গে তাঁর দাদাদের দেখা হয়নি। হিটলারের নাৎসি সেনা যুগোস্লাভিয়া দখলের পর সেখানে তথাকথিত 'শুদ্ধিকরণ' শুরু হয় অর্থাৎ ইহুদিদের প্রতি অত্যাচার এবং তিলে তিলে হত্যা। বাবা-মা ছোট ইলিয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হাঙ্গেরি পাঠাবার ব্যবস্থা করে; সেই যে বাবা-মাকে তিনি ছাড়লেন আর কোনোদিন তাদের সঙ্গেও দেখা হয় নি।

> ''যখন দূরে চিকচিকে রেললাইনটার ওপর দেখলাম রেলইঞ্জিনটা হুইসল্ বাজিয়ে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে আসছে, বাবার কাছে বায়না করলাম, ''বাবা তুমি আমাকে স্কুল পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসবে? ইলিয়ানা রোজেনবার্গের গলাটা একটু ধরে এল, বাবা আমার বায়না, আবদার মেনে নেয়নি, এরকম কখনও হয়নি। কিন্তু সেদিন বাবা একটা অদ্ভুত ব্যাপার করলেন। হাঁটু গেড়ে ছলছল চোখে আমার মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা গভীর চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি দু'হাত দিয়ে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরলাম। বাবাও দু'হাত দিয়ে আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরল। আমি বুঝতে পারছিলাম বাবার শরীরটা থিরথির করে কাঁপছে। বাবা অদ্ভুত একটা গলায় বললেন 'গুডবাই।' ট্রেনটা প্লাটফর্মে চলে এসেছিল। আমি কামরায় উঠে জানালার ধারে বসলাম বাবাকে টা-টা করব বলে। কিন্তু বাবা আর একবারও আমার দিকে ফিরে তাকালেন না। ট্রেনটা যখন প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দেখলাম বাবাও স্টেশনের বাইরে চলে যাচ্ছেন। আমি যতক্ষণ পারলাম জানালা দিয়ে বাবাকে দেখলাম। বাবা একটু একটু করে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেলেন। তখনও জানতাম না, সেই আমার বাবার সঙ্গে শেষ দেখা।''

এরপর বহু জায়গা ঘুরে শেষ অব্দি স্ট্যালাগ লুফত-এর বন্দিশালায় ঠাঁই পান। জার্মানির ডাকাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প কিংবা পোল্যান্ডের সেই কুখ্যাত আউশভিৎস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কথা প্রায় আমাদের সবারই জানা। ওখানে ইহুদিদেরই রাখা হত। কিন্তু স্ট্যালাগ লুফত ওয়ান মূলত মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধবন্দিদের শিবির। হিরণ্ময় হালদার ইংল্যান্ডের এয়ার বেস থেকে সম্ভাব্য জার্মান বিমানবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিমানের পাইলটের আসনে বসে যাত্রা শুরু করে। জার্মানদের একটি বিশাল বিমান বাহিনী ফ্রান্সের উপকূল অঞ্চলে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইংল্যান্ড আক্রমণ করার। এরকম একটি খবরের ভিত্তিতে হিরন্ময় হালদারের স্পিটফায়ার সহ ব্রিটিশ বিমানগুলি উড়ে যায় জার্মানি অভিমুখে। কিন্তু হিরন্ময়ের স্পিটফায়ারটি ট্র্যাপড হয়ে যায়। জার্মান বিমানকে তাড়াতে তাড়াতে ঢুকে পড়ে জার্মান ভূখণ্ডে আর তখনই তার স্পিটফায়ারের ইঞ্জিনে গোলা এসে লাগে। প্যারাশুটে করে নামে এক শস্য খেতে। ওটি ছিল জার্মান ভূখণ্ড। বন্দি হয় নাৎসি বাহিনীর হাতে। এসে পৌঁছোয় স্ট্যালাগ লুফাত ওয়ান-এ। এখানে থাকতে থাকতেই মার্কিন বন্দিদের একটি দলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন স্ট্যালাগ লুফাত ওয়ান-এর বন্দিশালা থেকে। সেই পালানোর সময় এক হাড় জির জিরে, বস্তার পোষাক পরা, মাথা ন্যাড়া ইহুদি মেয়েকেও হিরন্ময় উদ্ধার করেন।

> ''নিরাপদ একটা দূরত্বে পৌঁছে লম্বা একটা শ্বাস নিল হিরণ্ময়। অবশেষে মুক্তি। মেয়েটা তখন বিহ্বল একটা চোখে তাকিয়ে আছে হিরণ্ময়ের দিকে। 'ইউ আর ফ্রম হুইচ কান্ট্রি?' হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা ভাষাটা বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল। হিরণ্ময় খেয়াল করল নিজের গায়ে জার্মান গার্ডের ছদ্মবেশ থাকলেও মেয়েটার গায়ে এখনও বন্দিনীর পোশাক। বহুদিন থেকে শুনেছে আর একটু এগোলেই জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় বাল্টিক সাগরের ধারে। সেটা পেরোতে পারলেই ডেনমার্ক। সেখানে জার্মানদের হটিয়ে দিচ্ছে রাশিয়ার রেড আর্মি। স্যামুয়েল বলেছিল, ডেনমার্কে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করা আছে। কিন্ত কোথায় স্যামুয়েলরা? কেউ কোথাও নেই। আকাশের তারাগুলোই সম্বল। দিক ঠিক করে সেই দিকে মেয়েটাকে নিয়ে দৌড়তে থাকল হিরণ্ময়। জার্মানির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে থাকল একজন পুরুষ ও রমনী।''

অনেকগুলি কথাবৃত্তে ভাগ করা যায় এই 'স্পর্শ', উপন্যাসের আখ্যানকে। জরিনা ইসমাইলের ল-ফার্ম এবং ল-ফার্মের যে অনুসন্ধান সেই সম্পর্কিত কথাবৃত্ত; আব্বা অর্থাৎ জরিনার বাবা রশিদ ইসমাইল এবং জরিনা-এর সঙ্গে গালিবের শায়েরির জগৎ, এও এক কথাবৃত্ত নির্মাণ করেছে। হিরণ্ময় হালদারের বাড়ি থেকে পালানো এবং এয়ার ফোর্সে চলে যাওয়া, সেখানকার সহকর্মী, ট্রেনিং, ডগফাইট, যুদ্ধবন্দি হওয়া, পালানো। আবার ইলিয়ানা রোজেনবার্গ এর বড় হয়ে ওঠা, ইহুদি হবার জন্য প্রাপ্ত যন্ত্রণা, বন্দিত্ব, মুক্তি ও পুনর্জীবনপ্রাপ্তি, স্মৃতিচারণা। জার্মানি থেকে সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তিকে ঘিরে হিরণ্ময় হালদারের রক্তসম্পর্কীয়দের সক্রিয়তা ও সেই সূত্রে তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিরে আসা হিরণ্ময় হালদারের প্রতি পরিবারের অন্যদের বঞ্চনা ও পরে তাঁর মৃত্যুর আখ্যান— এই সব কথাবৃত্তগুলি কখনও একে অপরের থেকে আলাদা কখনও বা জুড়ে জুড়ে গেছে।

এই উপন্যাসের আখ্যানে কয়েকটি জিজ্ঞাসা ও চিন্তন স্বভাবতই উদ্ভুত হয়। প্রথমত: হিরণ্ময় হালদারের সঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক ছিল ইলিয়ানা রোজেনবার্গের। যার জন্য তাঁর (হিরণ্ময় এর) পাওয়া ক্রশ নিজের মৃত্যুর পর কবরে রাখবার কথা বলে গেছিলেন তিনি। আর একটি বিপুল সংখ্যক অর্থ বরাদ্দ করে গেছিলেন মৃত্যুপূর্ব উইলে হিরণ্ময় হালদারের জন্য। এই প্রশ্নটি হৃদয় থেকে আসে। পাঠক হৃদয়ে এই অনুসন্ধানের আকাঙ্খা ও ক্রমবর্দ্ধমান কৌতুহল আখ্যানের শুরু থেকে দেখা যাবে। যা পরে কয়েকবার বিভ্রান্ত হবে, গুলিয়ে যাবে। মনের মধ্যে যে বিদেশিনী সুন্দরীর সঙ্গে স্বদেশী বীরের প্রেমের ছবি গড়ে উঠেছিল তীব্র সংরাগ যুক্ত হয়ে তা ধাক্কা খেতে বাধ্য। কারণ এরকম কোনো টান-টান প্রণয়াতুর পরিস্থিতি কখনওই তৈরি হবার পরিসর পায়নি। 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' এইভাবে যদি হিরণ্ময় হালদার গেয়ে উঠতেন তবে সংবেদনাঘন পাঠক-হৃদয় তৃপ্ত হত। কিন্তু হিরণ্ময় বাবু তাঁর জীবৎকালে 'ইলিয়ানা রোজেনবার্গ' নামের কোনো নারীর কথা শোনেননি সম্ভবত। আর যিনি ইংল্যান্ডের এয়ার ফোর্সে বীরত্বের সঙ্গে কাজ করলেন, বিমান দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেন, নাৎসি ক্যাম্পে বন্দি

হলেন — সেখান থেকে পালাতেও সমর্থ হলেন; এই পালানো বলাবাহুল্য নিছক 'ভেগে' আসা নয় বরং ব্রিটেনের 'গৌরবময় পশ্চাদপসরণ' বা 'গ্লোরিয়াস রিট্রিট'-এর মতো; হলেন তিনি বিশেষভাবে সম্মানিতও। কিন্তু বাঙালির কাছে তিনি ব্রাত্য। তাঁর বাবা তাঁকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন আইনি লেখাপড়ার মাধ্যমে বৈধতা সম্পাদন করে বাড়ির অমতে এয়ারফোর্সে যোগ দেবার জন্য আম্বালা যাত্রার অপরাধে। ফিরে এসে কিছু বছর পর ৩৭/২ প্রিয়নাথ বোস লেনের হালদার বাড়ি থেকে তাঁকে চলে যেতে হয়। বলাবাহুল্য তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়িটি প্রোমোটারকে দেবার বিরোধিতা করায়। সেক্ষেত্রে তাঁর ভাইপো-ভাগ্নেরা দাখিল করেছিলেন হিরণ্ময় হালদারকে কৈলাসপতি হালদারের ত্যজ্যপুত্র করার আইনি কাগজ। এমনকী ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর সেটিও জানা নেই রক্ত সম্পর্কীয়দের, যাঁরা তাঁকে দিয়ে যাওয়া অর্থের অধিকারী হবেন। আর হিরণ্ময় হালদারের বড়দাদার বিধবা পুত্রবধূ যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করেছিলেন— তাঁর কাছেই শেষ সময়ে থাকতেন তিনি, শ্রীরামপুরে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর যে বীথি অর্থাৎ তাঁর প্রাক্তন ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ তাঁর শেষ সময়ে আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি কিন্তু ইলিয়ানা রোজেনবার্গ দেয় অর্থ পাবেনা কারণ জার্মান আইন অনুযায়ী পূনর্বিবাহের কারণে আর তিনি পাবার উপযুক্ত নন। দ্বিতীয়তঃ পাঠকের মস্তিষ্ক কী বলছে! জার্মান এমব্যাসি থেকে ল-ফার্মকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হিরণ্ময় হালদারের ফ্লাইং ক্রসটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ইলিয়ানা রোজেনবার্গের পার্থিব অবশেষের সঙ্গে সমাহিত করা হয়েছে। কিন্তু হালদার বাড়িতে গিয়ে জরিনা যা জানল তাতে দেখা যাচ্ছে সেই ফ্লাইং ক্রস চুরি গেছে। সেটি নাকি তাঁর ভাগনে কে দিয়ে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন কিন্তু চুরি যাবার কারণে দিয়ে যেতে পারেন নি। তাহলে চুরিটি করল কে? এই জিজ্ঞাসা কিন্তু পাঠককে ভাবাবেই। উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে এই বিষয়টির সমাধান সূত্র পাওয়া গেল। হিরণ্ময় হালদার তার ভ্রাতুষ্পুত্রের চিকিৎসার জন্য এই ক্রসটি বিক্রি করে দেন। তাঁর তেমন আর কিছু ছিল না কারণ পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি ইতোপূর্বে বঞ্চিত হয়েই ছিলেন। অবশ্য সবকিছুরই কিংবা অনেক দৃশ্যত ঋণাত্মক বিষয়ের মধ্যেও ধনাত্মক কিছু কিছু সূত্র লুকিয়ে থাকে। ইলিয়ানার যতগুলি ওয়ার মেমোরিয়াল লেকচারের ক্লিপিংস রয়েছে তাতে কিন্তু কোথাও হিরণ্ময় হালদারের নাম নেই। নাৎসি ইউনিফর্ম পরিহিত এক ব্যক্তি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং এভাবে তিনি নাৎসি বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেলেন। ইলিয়ানা নাম জানতে পারেন নি ততদিন পর্যন্ত যতদিন না তাঁর নাতনি ইমেলিন অকশন হাউস থকে ফ্লাইং ক্রসটা এবং তার সঙ্গে ছবিসহ হিরণ্ময় হালদারের জীবন ও কৃতির বিস্তারিত বিবরণ না এনেছে। ছবিটি দেখে তাঁকে চিনতে পারেন এবং তাঁর মনের মধ্যে অমলিন থাকা হিরণ্ময়ের উচ্চারণ করা কয়েকটি শব্দ — তার একটি অবশ্যই 'ইন্ডিয়া'। আর তখন ইলিয়ানার মনে হয় হিরণ্ময় হয়তো খুব আর্থিক সঙ্কটে পড়েছেন নয়তো ফ্লাইং ক্রসটিই বা বিক্রি করবেন কেন! তাই এই অর্থ বিষয়ক উইল।

তৃতীয়ত:, এক অভাবিতের আবির্ভাব। হিরণ্ময় হালদারের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ থাকছে। সেই মাঠে ফুটবল খেলা থেকে আকাশের উড়ো জাহাজ দেখে নিজেই উড়ো জাহাজ ওড়ানোর স্বপ্নে মজে যাওয়া। তারপর গৃহত্যাগ, আম্বালা যাওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। কিন্তু কোথাও ইলিয়ানা রোজেনবার্গের নাম নেই।

''বেখুদি বেসবব নহি, গালিব
কুছ তো হ্যায় জিস কি পর্দাহ্দারি হ্যায়।''

পেশায় ব্যবসায়ী রশিদ ইসমাইলও যেন আর এক দর্শক এবং প্রতিবেদক হয়ে যান এই আখ্যানের। যে আখ্যান শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দশকে আর যার ব্যাপ্তি মহাদেশীয় সীমানা ছাড়িয়ে। জরিনা ল-ফার্মের হয়ে অনুসন্ধান করছে একথা সত্য তবে কোনোদিন ব্যবসায় তেমন লাভের মুখ না দেখা, গালিবের শায়েরিতে ডুবে থাকা রশিদ ইসমাইলও জুড়ে গেছেন অচ্ছেদ্যভাবে। তিনি যেন মির্জা গালিবের চোখ দিয়ে অসীমান্তিক, কালখণ্ড-শিথিল উপাখ্যানের ওঠাপড়া দেখছেন। জরিনা যার যুগপৎ বাবা ও মা এই রশিদ ইসমাইল; তিনি তো গালিব-বাণে জরিনাকে বিদ্ধ করবেনই। গালিব যদি সেই 'নেক' জ্বিন হন তবে জরিনার সঙ্গে সঙ্গে এই আখ্যানও জ্বিনগ্রস্ত।

''গোটা ঘরটা নিশ্চুপ। শুধু নেবুলাইজার মেশিনটার ঘরঘরে চলার আওয়াজ। রশিদ ইসমাইল মেয়ের

হাতের উপর মৃদু টোকা দিলেন। জরিনা দেখল একটা কষ্টের মধ্যেও আব্বার চোখ দুটোয় যেন একটা প্রশান্তির হাসি। ঠিক বলেছ আব্বা। গালিব মিঞা যেমন বলে গিয়েছেন, পর্দাহদারি...পর্দাহদারি। ইলিয়ানা রোজেনবার্গের সঙ্গে হিরণ্ময় হালদারের প্রকৃত সম্পর্কটা পর্দাহদারি। হিরণ্ময় হালদারকে কেন ওঁর উত্তরসূরীরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, পর্দাহদারি। এমনকী, একটু আগে যে-স্বপ্ন দেখেছি সেটাও কেমন যেন-পর্দাহদরি। ফ্লাইং ক্রস, যেটা হিরণ্ময় হালদার রয়্যাল এয়ারফোর্স থেকে পেয়েছিলেন, যেটা আবার চুরি হয়ে গিয়েছে, সেটাও পর্দাহদারি। আবার ইলিয়ানা রোজেনবার্গ সম্পর্কে যে ব্রিফিং এমব্যাসি পাঠিয়েছে, তাতে লেখা আছে ইলিয়ানা রোজেনবার্গের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর কবরের মধ্যে রাখা আছে হিরণ্ময় হালদারের ফ্লাইং ক্রসটা। সেটাও কেমন যেন পর্দাহদারি। ঠিক বলেছ, কুছ তো হ্যায়... কিছু তো গোপন আছে। দিমাগের এই গোপনীয়তা জানার কোনও দরকার নেই কিন্তু দিল বড্ড অস্থির হয়ে যাচ্ছে।''

আখ্যানের ভেতরকার রহস্যগুলির মধ্যেও মির্জাগালিব পরিদর্শকের ভূমিকা নিয়ে আরও বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় পাঠটিকে ব্যঞ্জিত করেন।

লেখক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস নির্মাণের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় রয়েছে। বিশ্বজনীন একটি প্রেক্ষাপট তিনি রচনা করলেও ভারতের ঔপনিবেশিক বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাননি। শুধু তাই নয় শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গের যে বৈষম্য এখনও বিশ্বের অন্যতম অপ্রীতিকর বিষয়, তাও ফুটে উঠেছে। যখন ইংল্যান্ডে হিরণ্ময় হালদার বিমান চালনার কাজে যুক্ত সেখানেও দেখা যাচ্ছে তিনি তাঁরই সহকর্মী উইলির মতো মর্যাদা পান না। শুধু তাই নয় যদিও তাঁরা একই কাজ করেন তবু বহু জরুরি বিষয় তাঁর কাছে চেপে যায় তাঁরই টিমের লোকেরা। শুধু তাই নয় বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় —

'' 'ওহ! তুমি...' জড়ানো গলায় বলল উইলি, 'তোমার দেশ ইণ্ডিয়া। আমাদের রাজাই তো তোমাদের দেশের রাজা। লং লিভ দ্য কিং। বাই দ্য ওয়ে। শুনেছি ইন্ডিয়ানরা খুব ভাল বাবুর্চি হয়, তুমি রান্না করতে পার?' ...এগজ্যাক্টলি, তুমি এমন একটা দেশ থেকে রয়্যাল এয়ার ফোর্সে জয়েন করেছ, যে দেশ নিজেরাই ইন্টারনালি ব্রিটিশদের বিপক্ষে। এনিওয়ে, তোমাকে যেটা বলছিলাম, তোমরা তো জাত বাবুর্চি। রেফ্রিজারেটারে ল্যাম্ব স্টেক আছে দেখলাম। ক্যান্টিনের একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে জিভটা একটু স্বাদ বদল চাইছে। ইন্ডিয়ান কুইজিন। যাও না একটু রান্নাঘরে।''

কিংবা স্ট্যালাগ লুফত ওয়ান থেকে পালানোর সময় এবং তার পরিকল্পনার সময় হিরণ্ময় বিশেষভাবে সাহায্য করলেও বন্দিশালার বাইরে সঙ্গী স্যামুয়েল বা রিচার্ডেরা কেউ কিন্তু অপেক্ষা করেনি তারজন্য। বাল্টিক সাগরের ধারের ছোট্ট বন্দরটিতে হিরণ্ময়কে কারও সাহায্য ছাড়াই ইলিয়ানাকে নিয়ে পৌঁছোতে হয়েছিল। রেডক্রসের খাবারের প্যাকেট স্যামুয়েলের মতো মার্কিন সৈনিকেরা পেলেও হিরণ্ময় কখনও পায় নি। এক বিজিত জাতির প্রতিনিধির সঙ্গে আর এক বিজিত জাতির রিক্ত অবশেষের সঙ্গে ক্ষণিক দেখা। কেউই তো কম যায় না। যেমন হিটলার তেমনই চার্চিল। ইউরোপে ইহুদি নিধন এবং যুদ্ধে প্রাণহানি যেমন হচ্ছে তেমনভাবে পূর্ব এশিয়ায়ও চলছে ধ্বংসলীলা। জাপানের সঙ্গে মিত্রপক্ষীয়দের লড়াই। আর ভারতে প্রায় 'ম্যানমেড' বা 'চার্চিল মেড' এবং 'প্ল্যানড' এক দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ হওয়ার কিছু স্বাভাবিক প্রভাবক ছিলই কিন্তু তাকে চূড়ান্ত রূপ দেয় ইংরেজদের বিমাতৃসুলভ আচরণ। অন্যদিকে বিমানবাহিনী অর্থাৎ রয়্যাল এয়ারফোর্স এতদিন বোমা ফেলার টার্গেট হিসেবে বেছে নিতে এয়ারবেস, সৈন্যঘাঁটি এবং ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু চার্চিল এবং এয়ার মার্শাল আর্থার হ্যারিস লোকালয়ে বোমা ফেলার নীতি নেয়।

''এবার আমাদের টার্গেট হয়েছে জার্মানির এক একটা শহর বাছবিচার না করে নিশ্চিহ্ন করে দাও জার্মানদের। জার্মানির মাটির উপর এক একটা গ্রামে আমাদের প্লেনগুলোর আটোপাইলটের লিভারটা শুধু আরও নিখুঁতভাবে টানবে। প্লেন নোজ ডাইভ দেবে। নিখুঁত লক্ষ্যে বোমাটা ফেলে চোঁ করে মেঘের উপরে উঠে যাবে। পুরো জার্মান জাতিটার মনোবল ভেঙে ফেলতে হবে। ঠিক যেভাবে বেঙ্গ

লে চার্চিল তোমাদের মনোবলটা একদম গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন।... ওদিকে শীতে ঠিক ফসল তোলার মুখে বেঙ্গলে এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব হয়েছে। একদিকে নিজেদের চাষ করা শস্য নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে বর্মা থেকে আমদানি করা শস্যের সাপ্লাই চার্চিলের নির্দেশে বন্ধ। নিট রেজাল্ট, দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ চলছে তোমাদের দেশে বুঝলে হিরো, ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ। ইউরোপে যেমন ইহুদিরা না খেতে পেয়ে মরছে, তোমাদের দেশেও একই অবস্থা।...''

এটি যেন উপন্যাসের আর একটি 'প্যারালাল ন্যারেটিভ'। ইংল্যান্ডে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের কাজে যতদিন ছিলেন হিরণ্ময় ততদিন প্রায় ভুলেই ছিলেন নিজের শেকড়ের কথা। বিমান থেকে বোমা ফেলাটা নিছকই পেশা এবং প্যাশনগত একটা রুটিন মাফিক কাজ। মানুষের কিংবা প্রাণের তখন একমাত্র পরিচয় হল - একটি 'টার্গেট'। বাংলার দুর্ভিক্ষের কথায় তাঁর মনে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কিন্তু নাৎসি বন্দি শিবিরে খাবার খেতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে বাংলার মানুষের অবর্ণনীয় কষ্ট ও নিরন্নতার কথা। খেতে পারেন না তিনি।

ম্যাকলিন অ্যান্ড স্টুয়ার্ডের দক্ষ কর্মী জরিনা ইসমাইল যতই গালিবে ডুবে থাকুন ব্যক্তিগত জীবনে; কিন্তু নিজের পেশাগত জীবনে চূড়ান্ত পেশাদারিত্বের পক্ষপাতী। তাই নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট তিতলিকে জানায়— তাদের অনুসন্ধান থেকে যেসব তথ্য উঠে আসছে তাতে দেখা যাবে হৃদয় বলবে হিরণ্ময় হালদারের নিষ্ঠুর আত্মীয়েরা যেন রোজেনবার্গের দেওয়া অর্থ না পায়। অথচ তাদের পেশাগত দায়বদ্ধতা বলে জার্মান এমব্যাসি তাদের দুটি বিষয় মূলত স্থির করতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রথমত, হিরণ্ময় হালদার যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া। দ্বিতীয়ত, তাঁর রক্ত সম্পর্কিতদের তালিকা প্রস্তুত করা। তাদের সঙ্গে হিরণ্ময় হালদারের সম্পর্ক কেমন ছিল তা বিবেচ্য নয়। কিন্তু সেই পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গির নির্মোকও খসে পড়ে জরিনার; একাজে বাধ্য করেন অবশ্যই গালিব। হিরণ্ময় হালদারকে লেখা ইলিয়ানা রোজেনবার্গের একটি লেখা চিঠি সে চুরি করিয়ে এনে নিজের কাছে রাখে। যে কাজকে পেশাদারিত্ববোধসম্পন্ন জরিনা এতদিন অপেশাদারিত্বই ভাবত। কারণ এটা তার ওপর ন্যস্ত কাজের মধ্যে পড়েনা বরং কাজটাকে কিছুটা ঘুলিয়ে দেয়।

''এই চিঠিটা ইহুদি বন্দিনী সেই বাঙালি পাইলটকে লিখেছিলেন। তবে চিঠিটা কোনও দিন সেই বাঙালি পাইলটের হাতে পড়ে নি। তুমি আমাকে মাঝে মাঝে যে কথাটা বলো, 'বেটি কভি কভি দিমাগ কি বাত ছোড়কর দিল কি বাত শুননা জরুরি হ্যায়।' আমি সেই দিল কি বাত শুনে একটা বন্ধ পরিত্যক্ত ডাকবাক্স থেকে এই চিঠিটা চুরি করিয়ে আনিয়েছি। তুমি চিঠিটা একটু শোনো।''

জরিনা এই প্রসঙ্গে রশিদ ইসমাইলকে জানায় যে এই কেসে কাজ করার সময় গালিবের কাছে তার অন্তঃকরণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। গালিবের শায়েরি সে গালিবকেই শুনিয়েছে যা রশিদ ইসমাইলকে আজন্মকাল বলতে শুনেছে।

''গো মৈঁ রহা রহীন-এ সিতমহা-এ রোজগার;
লেকিন তেরে খয়াল সে গাফিল নহি রহা।''

জীবিকার তাগিদে কিংবা চাপে নাজেহাল হয়েছি বছরের পর বছর তবু তোমার ভাবনা মন থেকে সরে যায়নি কখনও। যেমন করে রোজেনবার্গও ভোলেননি সেই ভারতীয় সৈনিকের কথা। জরিনার কাছে থাকা রোজেনবার্গের লেখা সেই চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করব।

''প্রিয় সৈনিক,

আমি জানি, এতদিন পরে আমি আমার পরিচয় দিলেও আপনি তা স্মরণ করতে পারবেন না।... আমি আপনার ভাষা জানতাম না, আপনিও আমার ভাষা জানতেন না। কিন্তু স্ট্যালাগ লুফতের যুদ্ধবন্দিদের শিবির থেকে পালিয়ে যাওয়ার মোক্ষম মুহূর্তে আপনি অন্ধকারেও আমার চোখের ভাষা পড়ে নিয়েছিলেন। ... আমি নিজেকে চরম হতভাগ্য মনে করি, বহুদিন পর্যন্ত আমার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ বীরের নামটা আমি জানতাম না।... ইমেলিন অকশন হাউজ থেকে আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছিল। ওর খুব ইচ্ছে ছিল ভারতে একবার আমাকে নিয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে আনার। একাধিকবার চিঠিও দিয়েছিল আপনাকে। কিন্তু আপনার দিক থেকে কোনও উত্তর পায়নি। এটাই হয়তো আপনাকে

আমার শেষ চিঠি। ঈশ্বর অশেষ করুণা করে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এবার তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে আমার। হাসপাতালে শয্যাশায়ী আমি। আমি আমার পুরো পরিবারকে ডেকেছিলাম গতকাল। ষাট বছর ধরে ওয়ার মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে যে সান্মানিক আমি পেয়েছি তার একটি পেনিও আমার পরিবার কখনও খরচ করেনি। আমি এই সঞ্চিত অর্থের একটি অংশ বেলগ্রেডের একটি কনভেন্টকে এবং বাকি অংশ আপনাকে দিয়ে যাওয়ার মনস্থ করেছি। আপনার ফ্লাইং ক্রস আমার নশ্বর শরীরের সঙ্গে সেই সম্মান এবং ভালোবাসায় থাকবে ঠিক যেমন থাকবে আমার মায়ের দিয়ে যাওয়া রোজারিটা। হে বীর সৈনিক, এই পৃথিবীতে আপনার বাকি জীবন যাতে অর্থকষ্টে থাকতে না হয় এটুকুই আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস। এটি ধৃষ্টতা মনে হলে মার্জনা করবেন। আপনার যাতে কোনও রকম সম্মানহানি না হয়, তাই আমি আমার ল-ফার্মকে এই উদ্দেশ্যটি একান্ত গোপনীয় রাখতে নির্দেশ দিয়েছি।

ঈশ্বরের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

বিনীত -

ইলিয়ানা রোজেনবার্গ।”

রোজেনবার্গ জানান যে, নাৎসি জার্মানিতে সব জার্মান কিন্তু নাৎসি হয়ে যায় নি। অনেকে যারা নাৎসিদের বিরোধিতা করেছে তাদের অবস্থাও ইহুদিদের মতো হয়েছে গুটিকয়েক যুদ্ধবাজ, ঘৃণারবাতাবরণ সৃষ্টিকারী মানুষের হাতে। শুধু তাই নয় নাৎসিদের মধ্যে সেইসব লোকজনও দেখা গেছে, যাঁরা সহমর্মী ছিল ইহুদি এবং বদ্রিদের প্রতি। কেউ কাজের ক্ষেত্রে বহুরকম সুবিধে করে দিত; পলায়নের প্রচেষ্টারতদের দিকে জার্মান বাহিনীর কুকুরেরা তেড়ে গেলে তাদেরকে টেনে সরিয়ে নিয়েছে। পালানোর জন্য বেড়ার তার কাটার যন্ত্র এগিয়ে দিয়েছে। আজকের জার্মানিতে খুবই সামান্য সংখ্যক নব নাৎসি মনোভাবাপন্ন লোক থাকলেও অধিকাংশই কিন্তু যুদ্ধবিরোধী এবং মানবতাবাদী। তাই সিরিয়া যুদ্ধ পর্বে জার্মানি হল অন্যতম দেশ যারা একটি বড় সংখ্যক শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। হিরণ্ময় হালদার এবং ইলিয়ানা রোজেনবার্গের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন এই ক্ষণিক সম্পর্ক এবং পরবর্তী পরিণতি ভারত-জার্মানি সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা আনতে পারে বইকী! যদিও এটি একটি কল্পকথা কিংবা কিয়ৎ সত্যের ছায়া অবলম্বনে সৃষ্টি।

[উদ্ধৃতিগুলি (শারদীয়া দেশ-১৪২৪)-এ প্রকাশিত উপন্যাসটি থেকে গৃহীত।]